মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

আসহাবে কাহাফের কিস্‌সা
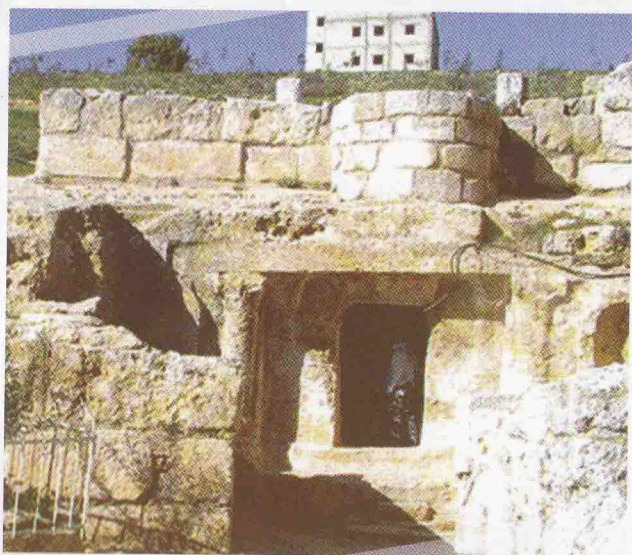
আসহাবে কাহাফের কিস্‌সা

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)

দোকান নং - ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৯২১-০৯২৪৬৭

আসহাবে কাহাফের কিস্‌সা
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল
প্রথম ঃ জুলাই, ১৯৭৪ ॥
৩য় ঃ এপ্রিল ২০০৯ ॥
বৈশাখ ১৪১৬ ॥
রবিউল সানি ১৪৩০ ॥

প্রকাশক
মোস্তাফা জহিরুল হক
খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ শিল্পী
আবদুল্লাহ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস
মোস্তাফা কম্পিউটার্স (ওয়ালী উল্যাহ ভূঁইয়া)
১০/ই-এ/১ মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস,
২৬,তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ ১০.০০ টাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আসহাবে কাহাফের কিস্‌সা

কুরআন মজীদের সূরা আল-কাহাফে চারটি কিস্‌সা বা কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এ চারটি কিস্‌সাকে এ সূরার প্রাণসম্পদ কিংবা ভিত্তিপ্রস্তর বলে অভিহিত করা চলে। কুরআন মজীদের মৌল শিক্ষা, উপদেশ ও জ্ঞানগর্ভ যুক্তি-প্রমাণ এ চারটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এ চারটি কিস্‌সা হলো ঃ ১. আসহাবে কাহাফের কিস্‌সা, ২. দু'জন বাগান-মালিকের কাহিনী, ৩. হযরত মূসা ও খিজির (আ)-এর কিস্‌সা এবং ৪. যুল্‌কারনাইনের ইতিবৃত্ত। এ চারটি কিস্‌সার প্রত্যেকটিই বর্ণনাভঙ্গি ও পূর্বাপর বিষয়ের দৃষ্টিতে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু মূল বক্তব্য ও মৌল ভাবধারার বিচারে সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন। এই মৌল ভাবধারাই এ চারটি কাহিনীকে পরস্পর সম্পৃক্ত এবং একই সূত্রে গ্রথিত করে দিয়েছে।

বস্তুত দুটি মতাদর্শ, দুটি আকীদা-বিশ্বাস এবং দুই প্রকারের মনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কাহিনীতে পরিপূর্ণ এই সূরাটি। এক দিকে বস্তুবাদ ও বস্তুসর্বস্ব জিনিসের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও নির্ভরতা। অপরদিকে গায়েবের প্রতি ঈমান, আল্লাহ্‌র প্রতি প্রত্যয় এবং দুই প্রকারের মনস্তত্ব ও মতাদর্শ সঞ্জাত মানসিকতা, কর্মতৎপরতা ও চরিত্র। আল্লাহ ও অদৃশ্য শক্তির প্রতি অবিশ্বাস এবং বস্তু ও বস্তু বিকাশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্বুদ্ধিতা ও অন্তঃসারশূন্যতারই স্পষ্ট বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে এই সূরাটিতে।

'আসহাবে কাহাফ' কিস্‌সার গুরুত্ব

সূরা কাহাফে সর্বপ্রথম আমাদের সামনে আসে আসহাবে কাহাফ অবরকীমের কিস্‌সা। (এ রচনায় এ কিস্‌সাটিই আলোচিতব্য।) কিন্তু এ আস্‌হাবে কাহাফ কারা ছিল, মানবেতিহাসে এই কিস্‌সার মূল্য ও গুরুত্ব কি এবং কুরআন মজীদেই বা এই কিস্‌সাকে এতটা গুরুত্ব ও সুষ্ঠতা সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে কেন— কেনই বা এটা একটা জীবন কাহিনীর মর্যাদা পেল এবং ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে এ কাহিনী বার বার কেন বিবৃত ও শুনানো হয়েছে তা গভীরভাবে বিবেচনা সাপেক্ষ।

আসহাবে কাহাফের কোন উল্লেখ বাইবেলের ওল্ডটেস্ট্যামেন্ট (পুরাতন নিয়ম)-এ নেই। কেননা এ ঘটনা খ্রিস্টান-ইতিহাসের যে পর্যায়ে সঙ্ঘটিত হয়েছিল, তখন হযরত ঈসা (আ)-এর শির্‌ক পরিহার ও তওহীদ গ্রহণের দাওয়াত তাঁর অনুসারীদের মাধ্যমে চারিদিকে বিস্তার লাভ করেছিল এবং

ওল্ডটেস্ট্যামেন্টের সর্বশেষ গ্রন্থ রচনার কাজও তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। উপরন্তু ইয়াহূদী সমাজের নিকট এ ঘটনার তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না এবং এ কাহিনীর সংরক্ষণ ও পরবর্তী বংশধরদের নিকট তা যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়ার নির্ভরযোগ্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনও তারা অনুভব করেনি। অবশ্য খ্রিস্টানদের পক্ষে এ কাহিনী খুবই চিত্তাকর্ষক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিতে অপূর্ব কৌতুহল-উদ্দীপক ছিল। কেননা অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীর তুলনায় এ কাহিনী যেমন বিস্ময়কর ঘটনা সম্বলিত তেমনি আকর্ষণীয়ও বটে। উপরন্তু এ কাহিনী থেকে হযরত ঈসা (আ)-এর নব্য অনুসারীদের অভূতপূর্ব মনোবল, আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরম নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা এবং অনমনীয় ঈমানী শক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। বর্তমান সময়ও ঈমানের ছাই-চাপা স্ফুলিঙ্গ থেকে তেজস্বী আগুনের লেলিহান শিখা প্রজ্জ্বলিত করা, ঘুমন্ত ঈমানী চেতনাকে পুনর্জাগরিত ও পুনঃউদ্দীপিত করা এবং বিপরীত মতাদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তিকে উৎক্ষিপ্ত করার জন্যে এ কাহিণী এক আমোঘ অস্ত্রের কাজ দিতে সক্ষম। একালের আদর্শবাদী যুব শক্তিকে আদর্শ রক্ষার অনলস সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার প্রেরণা এ কাহিনীতে নিহিত রয়েছে। এ কাহিনীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব মানবেতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার দাবিতে সোচ্চার। এ কারণে পৃথিবীর সব সমাজেই এ কাহিনী অনন্য খ্যাতি ও চিরভাস্বরতা লাভে সমর্থ। প্রাচীনকালের খ্রিস্টানরা এ কাহিনীকে কিভাবে বুঝেছেন, গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্যে তা সংরক্ষণ করেছেন, তা গুরুত্ব সহকারেই আলোচিতব্য।

'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব এ্যাথিকস্ এ্যান্ড রিলিজিয়ন'-এর নিবন্ধকার এ পর্যায়ে যা কিছু লিখেছেন তার সারমর্ম এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

সাতজন নিদ্রিত ব্যক্তির (Seven Sleepers) কিস্‌সা মহান ব্যক্তিদের কিস্‌সার মধ্যে গণ্য। বিবেক-বুদ্ধির সান্ত্বনা ও পরিতৃপ্তির সর্বাধিক উপাদান এ কিস্‌সায় রয়েছে। বিশ্বের দকি-দিগন্তে এ কিস্‌সা সর্বাধিক পরিচিত ও সুবিদিত। মূল ঘটনার যে বিবরণ প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে তা হলোঃ সম্রাট ডেসিয়াস (Decius) গ্রীসের প্রাচীন শহর এফিসাস (Ephesus) এ গিয়ে মূর্তি-পূজার পুনঃপ্রবর্তনে উদ্যোগী হয়। শহরের অধিবাসীদের— বিশেষ করে খ্রিস্টানদেরকে সে মূর্তির উদ্দেশ্যে বলিদান করার নির্দেশ দেয়। ফলে খ্রিস্টানরা দলে দলে খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের ধর্মমতে অবিচল হয়ে থাকে এবং সরকারের সর্বপ্রকার নির্যাতন ও নিষ্পেষণ অকাতরে বরদাশত্ করতে প্রস্তুত হয়। এই সময় রাজকীয় প্রাসাদের সাতজন যুবককে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে গোপনে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার অভিযোগ আনা হয়। মূর্তির উদ্দেশ্যে কোনরূপ বলিদান করতেও

তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে বলে অভিযোগ উঠে। সম্রাট তখন তাদেরকে কিছুদিনের জন্যে অবকাশ দেয় এই আশায় যে, হয়ত এ যুবকরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুধরে যাবে এবং খ্রিস্টধর্ম পরিত্যাগ করে তার মতাদর্শ গ্রহণ করবে। অতঃপর সম্রাট শহর ছেড়ে চলে যায়।

এই সময় উক্ত যুবকগণ শহর ত্যাগ করে এ্যাঞ্চিলাস (Anchilus) নামক নিকটবর্তী এক পর্বতগুহায় আত্মগোপন করে এবং সেখানেই থাকতে শুরু করে। তাদের মধ্যে ডিওমেডিস (Diomedes) নামক যুবকটি ছদ্মবেশ ধারণের উদ্দেশ্যে নিজের নাম বদলে দিয়ে ইমড্‌লিকাস (Imdlicus) নাম ধারণ করে। সে ছেঁড়া ও ময়লা কাপড় পরে শহরে গমন করে। দেশের সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহই ছিল তার উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে নিজের ও সঙ্গীদের জন্যে কিছু খাবার সংগ্রহ করারও তার ইচ্ছা ছিল। কিছু দিন যেতে না যেতেই সম্রাট ডেসিয়াস পুনরায় শহরে ফিরে আসে এবং উক্ত যুবকদেরকে তার সামনে উপস্থিত করার নির্দেশ দেয়। 'ডিওমেডিস' তার সঙ্গীদেরকে এ রাজকীয় ফরমান সম্পর্কে অবহিত করে। তারা স্বাভাবিক খাবার গ্রহণ করে, কিন্তু এ সংবাদে তারা গভীরভাবে ভাবিত ও চিন্তাভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এক দীর্ঘ ও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেন।

এদিকে এ যুবকদের কোন খোঁজ-খবর না পাওয়ায় তাদের বাপ-মাকে ডেকে পাঠানো হয়। তারা ছেলেদের নিখোঁজ হওয়ার সাথে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কতার কথা জানায়। এ 'ষড়যন্ত্রে' তাদের কোন হাত থাকার কথাও তারা স্পষ্টতর ভাষায় অস্বীকার করে। তারা সম্রাটকে জানায় যে, যুবকরা সম্ভবত এ্যাঞ্চিলাস পর্বতে আত্মগোপন করে আছে। সে অনুসারে সম্রাট একটি বড় প্রস্তরখণ্ড দ্বারা পর্বতগুহার মুখ বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেয়— যেন তারা গুহার ভিতরে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে স্বতঃই মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয় ও সেখানেই চিরতরে সমাধিস্থ হয়ে থাকে। থিওডোর (Theodore) এবং রুফিনাস (Rufinus) নামক দুজন খ্রিস্টান এ শহীদ যুবকদের কাহিনী একটি প্রস্তর ফলকে লিখে গুহামুখে স্থাপিত প্রস্তরের নিচে প্রোথিত করে রাখে।

তিন শ' সাত বছর পর সম্রাট দ্বিতীয় থিওডসফিয়াসের সময়ে দেশে এক বিদ্রোহ সঙ্ঘটিত হয়। কতিপয় খ্রিস্টানই ছিল এ বিদ্রোহের নায়ক এবং হোতা। পাদ্রী থিওডোর (Theodore)-এর নেতৃত্বাধীন একটি দল মৃত্যুর পর জীবন ও দৈহিক পুনরুত্থানের (হাশর-নশর) আকীদা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। খ্রিস্টান সম্রাট তার দরুন ভীত ও চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। এসময় আল্লাহ তা'আলা 'এ্যাডোলিয়াস' (Adolius) নামক এক সমাজ-প্রধানের মনে ছাগপালের জন্যে উক্ত গুহার নিকটবর্তী উন্মুক্ত স্থানে একটি খোয়াড় প্রস্তুত করার কথা জানিয়ে দেন। এ্যাডোলিয়াস খোয়াড় নির্মাণ কালে সেই প্রস্তর খণ্ডটিও কাজে লাগায় যা

দিয়ে গুহামুখ বন্ধ করা হয়েছিল। এর ফলে গুহামুখ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তখন সেই যুবকদের নিদ্রাভঙ্গ ঘটান। তারা জাগ্রত হয়ে মনে করতে থাকে যে, তারা হয়ত মাত্র একটি রাত ঘুমিয়েছে। এ সময় তারা পরস্পরকে উপদেশ ও উৎসাহ দান করে এই বলে যে, প্রয়োজন হলে তারা যেন ডেসিয়াসের হাতে শাহাদাত বরণ করতেও প্রস্তুত থাকে।

তাদের মধ্য থেকে 'ডিওমেডিস' (Diomedes) নামক যুবকটি যথারীতি শহরে গমন করে এবং শহরের প্রবেশ-দ্বারে ক্রুশ চিহ্ন দেখতে পেয়ে গভীরভাবে বিস্মিত ও হতচকিত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সে বাধ্য হয়ে একজন পথিককে এটা সত্যিই 'এফিসাস' শহর কিনা তা জিজ্ঞেস করে। এ অভাবিত বিপ্লব সম্পর্কে সঙ্গীদের অবহিত করার জন্যে সে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠে। কিন্তু মনের উচ্ছ্বাসকে দমন করে সে খাবার ক্রয় করে। মূল্য বাবদ সে দোকানীর হাতে তার নিকট রক্ষিত মুদ্রা তুলে দেয়। কিন্তু তা ছিল সেই তিন শ' বছর পূর্বের ডেসিয়াসের আমলের প্রচলিত মুদ্রা। দোকানী তা দেখে মনে করে, ছেলেটি হয়ত পুরানো দিনের গুপ্ত সম্পদ পেয়েছে। তাই সে নিজে এবং বাজারের অন্যান্য লোকের তাতে নিজেদের ভাগ বসাতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং যুবকটিকে ধমকাতে ও ভয় প্রদর্শন করতে শুরু করে। তারা শহরের মাঝখান দিয়ে যুবকটিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। তা দেখে তাকে ঘিরে একটা প্রচণ্ড ভিড় জমে ওঠে। যুবকটি চারদিকে তাকাতে থাকে। কোন চেনা-জানা চেহারা দেখা যায় কি না এই আশায়। কিন্তু পরিচিত কেউ-ই তার দৃষ্টিগোচর হয় না। স্থানীয় প্রশাসক বিশপ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তখন সে সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে। অতঃপর সে লোকদেরকে তার সঙ্গে যাওয়ার ও গুহায় অবস্থানকারী অন্যান্য সঙ্গীদের সাথে সাক্ষাত করার আহ্বান জানায়। উপস্থিত লোকেরা তার সঙ্গে পর্বতচূড়া পর্যন্ত গমন করে। সেখানে তারা শীশার দুটি ফলক দেখতে পায়। এতে করে যুবকের বর্ণিত সব কাহিনীর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। তারা গুহায় প্রবেশ করে এবং দেখতে পায় যে, যুবকের সব কয়জন সঙ্গী-সাথীই জীবিত রয়েছে। তাদের মুখমণ্ডলে এক অদ্ভূত জ্যোতি ও পরম স্থিরতা প্রতিভাত হচ্ছিল। পরে এই সংবাদ সম্রাট থিওডসফিয়াস (Theodosfius) পর্যন্ত পৌঁছায়। সে-ও গুহা পরিদর্শনের জন্যে আসে। এই সময় ম্যাক্সিমিলান (Maximilan) কিংবা এ্যাচিলিডিস (Achillides) অথবা অন্য কোন যুবক বলে উঠে, আল্লাহ তা'আলা এ যুবকদের নিদ্রাচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন এবং কিয়ামতের আগেই তাদের জাগিয়ে দিয়েছেন এ উদ্দেশ্যে যে, এ ঘটনার দ্বারা হাশর ও পুনরুত্থানের সত্যতা যেন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হতে পারে। এরপর এ যুবকগণ স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে এবং তাদের স্মৃতিরক্ষার্থে তথায় একটি রোমান উপাসনালয় নির্মাণ করে দেয়া হয়। (Encyclopaedia of Religions and Ethics. Article : Seven Sleepers)

এই কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনা, কিস্‌সা-কাহিনী ও কিংবদন্তী বর্ণনাকারীরাও এই কাহিনীর সত্যতা স্বীকার করেছেন। তারা কেউ-ই এরূপ ঘটনাকে অসম্ভব মনে করেন না। সমগ্র খ্রিস্টান জগতেও এই কাহিনীর সত্যতা স্বীকৃত এবং ব্যাপকভাবে সর্বমহলে বিবৃত ও কথিত। বস্তুত যে সমাজে পরকাল ও হাশর-নশর হাস্যস্পদ, কুসংস্কার ও অসম্ভব ব্যাপার রূপে উপেক্ষিত, উপহাসিত ও অগ্রহণযোগ্য, সেখানে আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতে এই ধরনের একটি ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়া একান্তই অপরিহার্য ছিল। এ ঘটনা মানুষের জন্যে চিরকালই এক বিস্ময়কর ও পরকাল সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় অপনোদনকারী রূপে পরিগণিত। আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ কিতাব কুরআন মজীদেও এই কাহিনী সবিস্তারে উদ্ধৃত এবং নির্ভুলভাবে বিবৃত হয়েছে।

এই কিস্‌সা বর্ণনার সময় মুসলমানদের অবস্থা

ইতিহাসের যে অধ্যায়ে এই ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়েছিল, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পরিচালিত ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় অনুরূপ একটি পরিস্থিতি পরিবেশ বিরাজ করছিল। সেই পটভূমিতে এই ঘটনার বিবরণ একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসেবে কুরআনের মাধ্যমে মক্কার জনগণের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছিল। ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের সেই পর্যায়ে মক্কার স্বল্পসংখ্যক মুসলমান যে প্রতিকূল পরিস্থিতি মুকাবিলা করছিল, রোমান কাইজারদের নির্মম অত্যাচার, নির্যাতন ও স্বৈরনীতির ফলে গুহাবাসীরাও ঠিক অনুরূপ অবস্থারই সম্মুখীন হয়েছিল। যে অবস্থায় এ ঈমানদার যুবকগণ গৃহত্যাগ করতে ও নিভৃত নির্জন পর্বতগুহায় আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হয়েছিল, কুরআন মজীদে এই কাহিনীর অবতরণ কালে ঠিক অনুরূপ অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছিলেন তদানীন্তন মক্কার মুষ্টিমেয় মুসলমানরা। এই সময়কার মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থার সঠিক চিত্র অংকন করা হয়েছে সূরা আন্‌ফালের এ আয়াতে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ -

স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন (মক্কায়) তোমরা খুব কম সংখ্যক ছিলে এবং দেশে তোমাদের খুবই দুর্বল অক্ষম মনে করা হতো। তোমরা প্রতি মুহূর্তে ভয়ে কম্পিত হয়ে থাকতে যে, লোকেরা তোমাদের ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে না যায়। (আয়াত ঃ ২৬)

দিয়ে গুহামুখ বন্ধ করা হয়েছিল। এর ফলে গুহামুখ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তখন সেই যুবকদের নিদ্রাভঙ্গ ঘটান। তারা জাগ্রত হয়ে মনে করতে থাকে যে, তারা হয়ত মাত্র একটি রাত ঘুমিয়েছে। এ সময় তারা পরস্পরকে উপদেশ ও উৎসাহ দান করে এই বলে যে, প্রয়োজন হলে তারা যেন ডেসিয়াসের হাতে শাহাদাত বরণ করতেও প্রস্তুত থাকে।

তাদের মধ্য থেকে 'ডিওমেডিস' (Diomedes) নামক যুবকটি যথারীতি শহরে গমন করে এবং শহরের প্রবেশ-দ্বারে ক্রুশ চিহ্ন দেখতে পেয়ে গভীরভাবে বিস্মিত ও হতচকিত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সে বাধ্য হয়ে একজন পথিককে এটা সত্যিই 'এফিসাস' শহর কিনা তা জিজ্ঞেস করে। এ অভাবিত বিপ্লব সম্পর্কে সঙ্গীদের অবহিত করার জন্যে সে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠে। কিন্তু মনের উচ্ছ্বাসকে দমন করে সে খাবার ক্রয় করে। মূল্য বাবদ সে দোকানীর হাতে তার নিকট রক্ষিত মুদ্রা তুলে দেয়। কিন্তু তা ছিল সেই তিন শ' বছর পূর্বের ডেসিয়াসের আমলের প্রচলিত মুদ্রা। দোকানী তা দেখে মনে করে, ছেলেটি হয়ত পুরানো দিনের গুপ্ত সম্পদ পেয়েছে। তাই সে নিজে এবং বাজারের অন্যান্য লোকের তাতে নিজেদের ভাগ বসাতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং যুবকটিকে ধমকাতে ও ভয় প্রদর্শন করতে শুরু করে। তারা শহরের মাঝখান দিয়ে যুবকটিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। তা দেখে তাকে ঘিরে একটা প্রচণ্ড ভিড় জমে ওঠে। যুবকটি চারদিকে তাকাতে থাকে। কোন চেনা-জানা চেহারা দেখা যায় কি না এই আশায়। কিন্তু পরিচিত কেউ-ই তার দৃষ্টিগোচর হয় না। স্থানীয় প্রশাসক বিশপ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তখন সে সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে। অতঃপর সে লোকদেরকে তার সঙ্গে যাওয়ার ও গুহায় অবস্থানকারী অন্যান্য সঙ্গীদের সাথে সাক্ষাত করার আহ্বান জানায়। উপস্থিত লোকেরা তার সঙ্গে পর্বতচূড়া পর্যন্ত গমন করে। সেখানে তারা শীশার দুটি ফলক দেখতে পায়। এতে করে যুবকের বর্ণিত সব কাহিনীর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। তারা গুহায় প্রবেশ করে এবং দেখতে পায় যে, যুবকের সব কয়জন সঙ্গী-সাথীই জীবিত রয়েছে। তাদের মুখমণ্ডলে এক অদ্ভুত জ্যোতি ও পরম স্থিরতা প্রতিভাত হচ্ছিল। পরে এই সংবাদ সম্রাট থিওডসফিয়াস (Theodosfius) পর্যন্ত পৌঁছায়। সে-ও গুহা পরিদর্শনের জন্যে আসে। এই সময় ম্যাক্সিমিলান (Maximilan) কিংবা এ্যাচিলিডিস (Achillides) অথবা অন্য কোন যুবক বলে উঠে, আল্লাহ তা'আলা এ যুবকদের নিদ্রাচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন এবং কিয়ামতের আগেই তাদের জাগিয়ে দিয়েছেন এ উদ্দেশ্যে যে, এ ঘটনার দ্বারা হাশর ও পুনরুত্থানের সত্যতা যেন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হতে পারে। এরপর এ যুবকগণ স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে এবং তাদের স্মৃতিরক্ষার্থে তথায় একটি রোমান উপাসনালয় নির্মাণ করে দেয়া হয়। (Encyclopaedia of Religions and Ethics. Article : Seven Sleepers)

এই কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনা, কিস্‌সা-কাহিনী ও কিংবদন্তী বর্ণনাকারীরাও এই কাহিনীর সত্যতা স্বীকার করেছেন। তারা কেউ-ই এরূপ ঘটনাকে অসম্ভব মনে করেন না। সমগ্র খ্রিস্টান জগতেও এই কাহিনীর সত্যতা স্বীকৃত এবং ব্যাপকভাবে সর্বমহলে বিবৃত ও কথিত। বস্তুত যে সমাজে পরকাল ও হাশর-নশর হাস্যস্পদ, কুসংস্কার ও অসম্ভব ব্যাপার রূপে উপেক্ষিত, উপহাসিত ও অগ্রহণযোগ্য, সেখানে আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতে এই ধরনের একটি ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়া একান্তই অপরিহার্য ছিল। এ ঘটনা মানুষের জন্যে চিরকালই এক বিস্ময়কর ও পরকাল সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় অপনোদনকারী রূপে পরিগণিত। আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ কিতাব কুরআন মজীদেও এই কাহিনী সবিস্তারে উদ্ধৃত এবং নির্ভুলভাবে বিবৃত হয়েছে।

এই কিস্‌সা বর্ণনার সময় মুসলমানদের অবস্থা

ইতিহাসের যে অধ্যায়ে এই ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়েছিল, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পরিচালিত ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় অনুরূপ একটি পরিস্থিতি পরিবেশ বিরাজ করছিল। সেই পটভূমিতে এই ঘটনার বিবরণ একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসেবে কুরআনের মাধ্যমে মক্কার জনগণের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছিল। ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের সেই পর্যায়ে মক্কার স্বল্পসংখ্যক মুসলমান যে প্রতিকূল পরিস্থিতি মুকাবিলা করছিল, রোমান কাইজারদের নির্মম অত্যাচার, নির্যাতন ও স্বৈরনীতির ফলে গুহাবাসীরাও ঠিক অনুরূপ অবস্থারই সম্মুখীন হয়েছিল। যে অবস্থায় এ ঈমানদার যুবকগণ গৃহত্যাগ করতে ও নিভৃত নির্জন পর্বতগুহায় আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হয়েছিল, কুরআন মজীদে এই কাহিনীর অবতরণ কালে ঠিক অনুরূপ অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছিলেন তদানীন্তন মক্কার মুষ্টিমেয় মুসলমানরা। এই সময়কার মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থার সঠিক চিত্র অংকন করা হয়েছে সূরা আন্‌ফালের এ আয়াতে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ -

স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন (মক্কায়) তোমরা খুব কম সংখ্যক ছিলে এবং দেশে তোমাদের খুবই দুর্বল অক্ষম মনে করা হতো। তোমরা প্রতি মুহূর্তে ভয়ে কম্পিত হয়ে থাকতে যে, লোকেরা তোমাদের ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে না যায়। (আয়াত ঃ ২৬)

এ সময় মুসলিম সমাজ যে নিপীড়ন-নিষ্পেষণ, নির্মমতা অমানুষিকতা ও চরম অসহায়তার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছিল, হাদীস ও জীবনী গ্রন্থাবলীর হাজার হাজার পৃষ্ঠা সে রক্ত লেখায় ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে। হযরত বিলাল (রা), হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা), হযরত খাব্বাব (রা), হযরত মুসইব (রা), হযরত সামুইয়া (রা) প্রমুখ সাহাবী ও তাঁদের সঙ্গী-সাথীদের লোমহর্ষক ঘটনাবলী দুনিয়ার মানুষ কোন দিনও ভুলতে পারবে না। তৎকালীন মক্কার বিভীষিকাময় পরিবেশে মুসলমানদের জন্যে কোথাও আশার ক্ষীণ শিখাও জ্বলতে দেখা যায়নি। অত্যাচারের জগদ্দল পাথরে নিষ্পেষিত সেই সমাজে মুক্তির কোন আলোক রেখা বিচ্ছুরিত হওয়ার একটা ছিদ্রও কোথাও ছিলনা। এই সময়ের মুসলমানরা যেন যাঁতার দুখানি পাথরের মধ্যে পড়ে নিরন্তর নিষ্পেষিত হচ্ছিল নির্মমভাবে। একটি নির্দয় রক্ত-পিপাসু দানবের কবলে পড়ে তারা জীবন ও মৃত্যুর বিরামহীন সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সময়ের অবস্থা কুরআনের আর একটি আয়াতে সম্যকভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

حَتّٰٓى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ -

এমন কি তখন এ পৃথিবীর অসীম বিশালতা ও প্রশস্ততা সত্ত্বেও তা তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারা নিজেদের জীবন-প্রাণ নিয়ে নিরুপায় ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তারা তখন জেনে গিয়েছিল যে, আশ্রয় লওয়ার কোন স্থানই তাদের জন্যে নেই একমাত্র আল্লাহ্‌র আশ্রয় ছাড়া। *(সূরা তওবা ঃ১১৮)*

কুরআনে এই কিস্‌সার বর্ণনা

ঠিক এই কঠিন অবস্থায়ই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অহী নাযিল হয় এবং ঈমানদার লোকদের জন্যে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়, যা সংকীর্ণতার পর বিশাল বিস্তৃতি, দুঃখ-দুর্দশার পর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, অপমান ও লাঞ্ছনার পর সম্মান ও মর্যাদার এবং চরম প্রতিকূল অবস্থায় নিতান্ত অস্বাভাবিক উপায়ে খোদায়ী সাহায্য অবতীর্ণ হওয়ার বিস্ময়কর কাহিনীতে পরিপূর্ণ। সেই ঘটনাই হলো আসহাবে কাহাফের কাহিনী। এই ঘটনাটি মানুষের সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির জন্যে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। সকল প্রকার বৈষয়িক উপায়-উপকরণ, সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র থেকে বঞ্চিত কিন্তু ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান মুষ্টিমেয় কতিপয় যুবক কুফর, শিরক ও ফিস্‌ক-ফুজুরীর নিঃসীম নিঃছিদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েও এবং স্বৈরতন্ত্রের অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হওয়ার মতো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও কিভাবে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলো, বিশ্বমানবের নিকট তা চিরকালই বিস্ময়কর হয়ে থাকবে।

গ্রেট রোমান সাম্রাজ্যের আফিসাস (কিংবা আফসুস) শহরটি খ্রিস্টীয় ইতিহাসের সূচনায় প্রকাশ্য মূর্তিপূজা ও নগ্ন লালসাবাদের এক লীলাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সেখানে আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা শালীনতা ও চরিত্রবাদের কোন মূল্যই স্বীকৃত ছিল না। তদানীন্তন সরকারও দেশের সাধারণ মানুষকে মূর্তিপূজা ও নির্লজ্জতার এ গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দিতে উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছিল। নাগরিকদের মধ্যে কেউ এ শিরক ও লালসা-পংকিল জীবন ধারার বিরুদ্ধতা করলে তাকে মহামূল্য জীবন থেকেও বঞ্চিত হতে হতো। সমগ্র দেশ ও সমাজের জীবনযাত্রা শিরক, মূর্তিপূজা ও লালসা চরিতার্থ করার নির্লজ্জ ভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। তার বিপরীত কিছু করার বা করতে চাওয়ার একবিন্দু অধিকার ছিল না দেশের একটি নাগরিকেরও।

কিন্তু এহেন সমাজেও এমন কিছু লোক ছিল, যারা হযরত ঈসা (আ)-এর তওহীদী দাওয়াত এবং নৈতিক শালীনতা ও পবিত্রতা রক্ষার বিপ্লবী আমন্ত্রণ পেয়ে পূর্ণ আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে তা গ্রহণ করেছিল। এ দাওয়াত তাদের মন ও মগজে এমনভাবে দৃঢ়মূল হয়ে বসেছিল যে, তাকে বাদ দিয়ে জীবন যাপন করা ও বেঁচে থাকাই তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে গিয়েছিল। এ দাওয়াতকে তারা বৈষয়িক কোন মূল্যের বিনিময়েই ত্যাগ করতে রাজি ছিল না; প্রস্তুত ছিল না এ দাওয়াতের একবিন্দু অপমান বা অসুবিধা সহ্য করতে। এ জন্যে যদি নিজেদের জীবনও কুরবানী করতে হয় তাহলেও তারা কিছুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচ দেখাতে রাজি নয়।

ফলে তারা রাষ্ট্র-সরকারের ঘোষিত নীতি ও আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলতে শুরু করল। সরকার ছিল মূর্তিপূজক। দেশের কেউ তা অগ্রাহ্য করুক কিংবা তার প্রতি কোনরূপ উপেক্ষা দেখাক, তা সে সরকারের পক্ষে ছিল অসহ্য। সমাজ ছিল উচ্ছৃঙ্খল, দুর্নীতিপূর্ণ ও কলুষতাময়। এই কলুষতা ছাড়া অন্য কিছুতে তাদের মনের সমর্থন ছিল না। আর সরকার ও সমাজের আনুকূল্য ব্যতীত জীবন যে কতখানি দুর্বিসহ হয়ে পড়ে, কেবলমাত্র ভুক্তভোগীরাই তা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারে। সূরা 'কাহাফ'-এর ১৩ হতে ১৫ আয়াতে এই যুবকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى - وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ اِذًا شَطَطًا - هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۗ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۢ بَيِّنٍ ۗ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا -

ওরা ছিল কতিপয় যুবক। ওরা তাদের রব্ব-এর প্রতি ঈমান এনেছিল। আমরা হেদায়েতের দিক দিয়ে তাদের খুব দৃঢ় ও মজবুত বানিয়ে দিলাম এবং তাদের হৃদয়কে (ধৈর্য ও দৃঢ়তার বাঁধনে) শক্ত করে বেঁধে দিলাম। তারা যখন (সত্যের পথে) শক্ত হয়ে দাঁড়ালো, তখন তারা (স্পষ্ট ভাষায়) বলে দিলঃ আমাদের প্রতিপালক, মালিক ও প্রভু তো তিনিই, যিনি আসমান ও জমিনের প্রভু ও মালিক। তাঁকে ছাড়া আমরা অন্য কোন মানুষকে ডাকতে বা পূজা-উপাসনা ও আনুগত্য করতে প্রস্তুত নই। আমরা যদি তা করি, তাহলে তা বড়ই অন্যায় কাজ হবে। আমাদের জাতির এই লোকেরা—যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যান্য মা'বুদ ও উপাস্যকে মেনে নিয়েছে—তারা যদি মা'বুদই হবে তাহলে তার পক্ষে উজ্জ্বল প্রমাণাদি পেশ করেনা কেন ? (আসলে তাদের নিকট এর কোন প্রমাণ বা যুক্তিই নেই)। তাহলে মিথ্যা কথা বলে যারা আল্লাহ সম্পর্কে অমূলক দোষারোপ করে, তাদের চাইতে অধিক জালিম আর কে হতে পারে ?

কিন্তু প্রশ্ন হলো, ধরাপৃষ্ঠ যখন সংকীর্ণ হয়ে গেছে, সরকারের প্রভাবে সমগ্র দেশবাসী যখন তাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত ও খড়গহস্ত, জীবন-জীবিকার দ্বার যখন রুদ্ধ, তখন নিজেদের ঈমান রক্ষা করার কি উপায় হতে পারে ? তাদের সামনে এক ধরনের জীবন ছিল যেখানে ঈমান-আকীদা ও নৈতিক চরিত্র রক্ষার কোন সুযোগ নেই। অথবা এমন আকীদা-বিশ্বাস ছিল, যাতে জীবন ও স্বাধীনতার কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না। এর মধ্যে কোন্‌টিকে তারা গ্রহণ করবে আর কোন্‌টিকেই বা ত্যাগ করবে ?

এই কঠিন সংকটময় মুহূর্তে তাদের ঈমানই তাদের বড় বন্ধু হয়ে দেখা দিল। তাদের ঈমান তাদের মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় জাগিয়ে দিল যে, তারা বাতিল মতাদর্শ গ্রহণ করতে পারবেনা; বাতিল রাষ্ট্রশক্তির সাথে কোনরূপ সমঝোতা করতে কিংবা তার কাছে নতি স্বীকারও করতে পারবে না কোনমতেই। আর তা করতে যাবেই বা কেন ?

আল্লাহ্‌র এই পৃথিবী তো কিছুমাত্র সংকীর্ণ নয়; বরং অতীব বিশাল ও বিস্তীর্ণ। আল্লাহ্‌র মদদ তাদের জন্যে অবশ্যই আসবে। তাঁর প্রতি তাদের মনে পূর্ণ বিশ্বাস থাকা আবশ্যক— থাকা উচিত ভরসা ও নির্ভরতা। তারা নিজেরাই যখন সব রকমের বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা ও স্বাদ-আস্বাদন থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে সব সম্পর্ক ও সম্বন্ধ ছিন্ন করে নিয়েছে, তখন এই লোকালয়ে থেকে আর কি লাভ; কুরআন বলছে ঃ

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا –

(পরে তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল যে,) তোমরা যখন এই লোকদের থেকে এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এরা যাদের পূজা-উপাসনা করে তাদের থেকে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে নিয়েছ তখন তোমাদের কর্তব্য হলো, তোমরা পর্বতগুহায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের পরোয়ারদিগার তাঁর রহমতের ছায়া তোমাদের ওপর অবশ্যই ফেলবেন এবং তোমাদের সমস্ত ব্যাপারের সাফল্যের জন্যে তিনি প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য-সামগ্রী জোগাড় করে দিবেন। *(সূরা কাহাফ ঃ ১৬)*

তারা লোকালয় ত্যাগ করে নিজ নিজ ইচ্ছেমতো এক এক দিকে চলে যেতে পারত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে একসঙ্গে ও দলবদ্ধভাবে বসবাস করার মনোভাব জাগিয়ে দিলেন। তারা নিজেদের ঈমান রক্ষার সংকল্প নিয়ে শহর ত্যাগ করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পথ দেখালেন এমন এক প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত পর্বতগুহার দিকে, যে ধরনের গুহা নির্মাণ করা সাধারণত কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। গুহাটির অবস্থা ছিল এমন যে, সূর্যরশ্মি ও তাপ তাতে পৌঁছত বটে; কিন্তু তার ক্ষতিকর প্রভাব সেখানে পড়তে পারত না। প্রয়োজনাতিরিক্ত তাপমাত্রা থেকেও তারা সুরক্ষিত ছিল। সেই সঙ্গে মৃদুমন্দ বাতাস তাদের দেহে জীবনের হিল্লোল বইয়ে দিতে লাগল। কুরআন মজীদের এ সূরাটিতে গুহার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزْوَرُّ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ –

তারা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, তা এমনভাবে ছিল যে, যখন সূর্যোদয় হয় তখন তোমরা দেখবে তা তাদের ডান পাশ দিয়ে সরে থাকে। আর যখন সূর্য অস্ত যায় তখন তা বাম দিক থেকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় (অর্থাৎ সূর্যকিরণ কোন অবস্থায়ই ভিতরে প্রবেশ করে না) আর তারা তার মধ্যে প্রশস্ত স্থানে পড়ে থাকছে। *(সূরা কাহাফ ঃ ১৭)*

এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে গুহার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে তফসীরে রুহুল মা'আনীতে লেখা হয়েছে ঃ "গুহাবাসীদের গায়ে রৌদ্র আদৌ লাগত না, রৌদ্রের কারণে তাদের কষ্ট বা অসুবিধাও হতনা। তারা গুহার মধ্যবর্তি স্থানে অবস্থান করত। নতুন সতেজ বাতাস তারা নিয়মিত লাভ করত। গুহার কষ্ট ও সংকীর্ণতা এবং সূর্যের উত্তাপ ও প্রখর রৌদ্রকর থেকেও তারা সুরক্ষিত ছিল।" ইমাম রাযী লিখেছেন ঃ "গুহার মুখ উত্তর দিকে ছিল। সূর্য যখন উদয় হয় তখন তা ডান পাশে থাকত এবং যখন তা অস্ত যেত তখন উত্তর দিকে সরে যেত।"

এ গুহায় আশ্রয় নেয়ার ফলে বাইরের পুঁতিগন্ধময় সমাজ-পরিবেশ এবং চরিত্রহীন ও অত্যাচারী সমাজপতি ও তাদের সমর্থকদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আর অন্যদিকে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল জীবনের স্বভাবজাত উপায়-উপকরণ ও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বহির্বিশ্বের সাথে। তারা দুনিয়া থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও দুনিয়ার সব সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-সম্ভোগের সাথে তাদের নৈকট্য ঘটেছিল। আর তা ছিল তাদের অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ ঈমান ও ঈমান রক্ষার জন্যে অবিশ্রান্ত সাধনা ও তিতিক্ষা গ্রহণের কারণে আল্লাহ তা'আলার এক অফুরন্ত মেহেরবানী। এদিকে ইঙ্গিত করেই সূরা কাহাফের ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ –

তা ছিল আল্লাহ্‌র অশেষ নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি (যে, তারা ন্যায় ও সত্যের জন্যে দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিয়েছিল।) বস্তুত আল্লাহ যাকেই সাফল্যের পথ প্রদর্শন করেন সে-ই সে পথের পথিক হতে পারে।

এ গুহায় স্থান গ্রহণের পর তারা যে নিষ্কর্ম জীবন শুরু করেছিল, তা নয়। তারা সেখানে না বস্তুগত অন্ধকারে ডুবে ছিল, না তাদের হৃদয় মন অন্ধত্বের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল। তারা তাদের ধর্ম গ্রন্থের কিছু অংশ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল যা পড়ে পড়ে তারা যেমন এই নিরবচ্ছিন্ন অবসর কাটাত তেমনি ধর্মজ্ঞানে প্রতি মুহূর্তেই তারা নিজেদের সমৃদ্ধ করতে যত্নশীল ছিল। (কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ 'রকীম' থেকে কেউ কেউ তা-ই মনে করেছেন)।

তারা সঙ্গে করে যে পাথেয় ও জীবিকার সম্বল নিয়ে গিয়েছিল তা যখন নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা এক দীর্ঘ গভীর ও নিবিড় নিদ্রার কোলে তাদের সঁপে দিলেন। অতঃপর পানাহারের কোন প্রয়োজনই তাদের থাকল না। সূরা কাহাফে বলা হয়েছে ঃ

فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا –

অতঃপর আমরা তাদেরকে সেই গুহাতেই সান্তনা দিয়ে দিয়ে দীর্ঘ কয়েক বছরের জন্যে গভীর নিদ্রায় বিভোর করে দিলাম। *(১১ ঃ আয়াত)*

তাদের এই ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায়ই তাদের শহর ও গোটা সাম্রাজ্যে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। মূর্তিপূজা ও জৈব লালসার প্লাবন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তার যারা ধারক ও প্রচারক ছিল, কালস্রোত তাদের অনেকের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত ধুয়ে মুছে দিয়ে যায়। এ মূর্তিপূজা, শিরক, ধর্মহীনতা ও অশ্লীলতাবাদের ধ্বংসস্তূপের ওপর এক নতুন সমাজ ও নবতর রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ

সমাজ ও রাষ্ট্র ছিল এক আল্লাহ্‌র নিরংকুশ প্রভুত্ব ও হযরত ঈসা (আ)-এর মাধ্যমে প্রেরিত তাঁর দ্বীনের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাসী। শুধু তা-ই নয়, এ ধর্মমতের প্রচারক ও বাস্তবে কার্যকর করার প্রধান হোতাও হয়েছিল ঐ সমাজ ও রাষ্ট্র, অথচ পূর্ববর্তী সমাজ ও রাষ্ট্র এ মতেরই বিরুদ্ধতা করেছে; এ মতের ধারকদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন ও নিষ্পেষণ চালিয়েছে। কেবল এ ধর্মমতের কারণে হাজার হাজার মানুষকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কারাগারের অন্ধ কুঠরিতে বন্দী করে রাখতে ও শত শত মানুষকে নির্বাসিত করতেও একবিন্দু দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু কালের করাল-স্রোতে সেই সমাজ পতিরা কোথায় ভেসে গেছে, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত। এখন অবস্থা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। এখন তো এ ধর্মমতের সাথে সামান্য সম্পর্ক স্থাপনও সর্বাধিক গৌরবের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমাজে সম্মান, মর্যাদা ও সম্ভ্রম কেবল তাদের জন্যে, যাঁরা এ ধর্মমতে বিশ্বাসী ও তার ধারক ও প্রচারক। সর্বত্র তাদের জন্যে সাদর সম্ভাষণ ও বিপুল সম্বর্ধনা। আর ঠিক এ সময়ই গুহাবাসীদের দীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যায় ও তারা জেগে উঠে। সময়ের হিসাবে ইতোমধ্যে তিন শ' বছরেরও অধিক কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। কুরআন বলেঃ

وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا –

তারা নিজেদের গুহায় তিন শ' বছর পর্যন্ত (ঘুমিয়ে) থাকল। এছাড়া আরো নয়টি বছর...। *(কাহাফ ঃ ২৫)*

জাগ্রত হয়ে ওরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে, আমরা কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম? ওদের ঘুমিয়ে থাকার দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণে বেশ মতভেদ দেখা দেয়। এক একজন এক-একটা সময়ের কথা বলে। শেষে সমস্ত ব্যাপার আল্লাহ্‌র ওপর সোপর্দ করে। কেননা ওদের মতে ঘুমিয়ে থাকার সময়মাত্রা নির্ধারণের ওপর না দুনিয়ার কোন কাজ নির্ভর করছে, না ওদের ধর্মের কোন কিছু। তাই এ সূরার ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ، قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ –

ওদের একজন বলল ঃ আমরা এখানে কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম? সকলে বললঃ একদিন কিংবা একদিনের কিছু সময়। (কিন্তু নির্দিষ্ট সময় জানতে না পেরে) বলল ঃ আমাদের রব্ব-ই ভালো জানেন, আমরা কতক্ষণ এভাবে পড়েছিলাম।

কিছু সময়ের মধ্যেই তাদের সকলের তীব্র ক্ষুধা অনুভূত হলো। এরা একজন সঙ্গীকে দায়িত্ব দেয় এ জন্যে যে, সে কোথাও থেকে তাদের জন্যে উত্তম ও পবিত্র খাদ্যের ব্যবস্থা করুক। যে রৌপ্যমুদ্রা ওদের সঙ্গে ছিল, তা-ই দিয়ে তাকে তারা শহরে পাঠিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে সূরা কাহাফের ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَابْعَثُوٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ –

(বলল) আচ্ছা, একজনকে এ মুদ্রাটি দিয়ে শহরে পাঠিয়ে দাও। সে খুঁজে দেখবে, কার কাছ থেকে উত্তম খাবার পাওয়া যেতে পারে। যেখানেই পাওয়া যায়, কিছু পরিমাণ খাদ্য নিয়ে আসবে।

ওরা মনে করেছিল, দেশের সরকার এখনো বুঝি সেই পুরানো শত্রু ও তাদের ধর্ম-বিরোধীদের হাতেই রয়েছে এবং গোয়েন্দারা বুঝি এখানে ওদের খুঁজে বের করার জন্যে চারদিকে ঘুরাফিরা করছে। এজন্যে ওরা ওদের সঙ্গীকে শহরে যাওয়ার সময় খুব সতর্কতা ও লোকদের সাথে নম্রতা অবলম্বনের নির্দেশ দিল। বলল ঃ

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِىْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا –

আর হ্যাঁ, খুব সতর্কতার সাথে এবং চুপে চুপে নিয়ে আসবে কিন্তু। আমরা যে এখানে আছি, তা যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। কেননা, লোকেরা যদি জানতে পারে, তাহলে কিন্তু ওরা ছাড়বার পাত্র নয়; হয় আমাদের পাথর মেরেই শেষ করে দেবে কিংবা তাদের মুশরিকী ধর্মমতে ফিরে যেতে আমাদের বাধ্য করবে। আর তা যদি ঘটে, তাহলে তোমরা কখনো কল্যাণ পেতে পারবে না। *(সূরা কাহাফ ১৯-২০)*

মূর্তিপূজারীদের শাসন আমলে এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী এ যুবকদের ওপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার ও নিপীড়নের মর্মন্তুদ কাহিনী বর্তমান শহরবাসীর সকলেরই খুব ভালোভাবে জানা ছিল। ওরা যে জুলুম-উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে প্রাণ নিয়ে সহসা পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল, একথাও তারা বিস্মৃত হয়নি। আর আজ পর্যন্ত যে তাদের কোন খোঁজখবরও পাওয়া যায়নি, তাতে তাদের মনে পরম বিস্ময় বাসা বেঁধেছিল। এদিকে নব প্রতিষ্ঠিত ঈসায়ী সরকার নিত্য-নব কার্যসূচী নিয়ে পূর্ণোদ্যমে কাজ করে যাচ্ছিল। ঈসায়ী ধর্মের ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পুনঃপ্রবর্তনে তারা সচেষ্ট ছিল। এ ধর্মের বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন

নেতৃবৃন্দ এবং এর জন্যে ত্যাগ স্বীকারকারী ও শাহাদাত বরণকারী লোকদের কীর্তিকলাপ সংগ্রহ ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে তারা বদ্ধপরিকর ছিল। এদের একটা বড় রকমের স্মৃতি-চিহ্ন নির্মাণ করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছিল। আর এ পর্যায়ে 'আসহাবে কাহাফ'— আর রকীম' স্বভাবতঃই তাদের নিকট ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ফলে চারদিকে এদের সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনা হতে লাগল। এমনি সময় একদিন সদ্য ঘুমভাঙা গুহাবাসীদের সঙ্গী লোকটি খুব সতর্কতা সহকারে, নিজেকে গোপন করে লুকিয়ে, মুখ বাঁচিয়ে ডানে-বাঁয়ে ও সামনে-পিছনে তাকিয়ে গুহা থেকে রওনা হলো। কোনরূপ বিলম্ব না করে যে কোন ভালো খাবার নিয়ে গুহায় ফিরে আসাই ছিল ওর একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু ঘটনাক্রমে অতি আকস্মিকভাবেই সে গোটা শহরবাসীর দৃষ্টি-কেন্দ্র হয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে নিজে এবং তার অন্যান্য সঙ্গীরাও গোটা জাতির 'হিরো' হয়ে গেল। সরকারী ও বে-সরকারী উভয় পর্যায়েই ওদের ঈমানী দৃঢ়তা ও অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী চিরস্মরণীয় হয়ে উঠল। প্রতিটি ঘরে ওদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং প্রতিটি বৈঠকে ওদের চর্চা হতে লাগল ব্যাপকভাবে। এ পর্যায়ে কুরআন মজীদ অতি সংক্ষেপে বলে দিয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا –

আর (লক্ষ্য কর), আমরা সব লোককে ওদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিলাম। (ওদের কথা কিছুমাত্র গোপন থাকতে পারল না।) আর অবহিত করে দিলাম এ উদ্দেশ্যে যে, লোকেরা যেন নিশ্চিতভাবেই জানতে পারে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামত হওয়ায় একবিন্দু সন্দেহেরও অবকাশ নেই। *(সূরা কাহাফ ঃ ২১)*

বস্তুত গুহাবাসীদের দীর্ঘকালব্যাপী গভীর নিদ্রাকালে সরকার ও জনগণের মধ্যে যে আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং দীর্ঘ দিনব্যাপী সমাজ, সংসার ও নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পালিয়ে থাকার পর ওরা সহসাই যেভাবে আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে, তা ছিল আল্লাহ তা'আলার দেয়া প্রতিশ্রুতিরই বাস্তবায়ন। দ্বীনের শত্রুদের পরাজিত করা হয়েছে, তাদের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত নিঃশেষে মুছে গিয়েছে—বাইরের দুনিয়া থেকেও যেমন, মানুষের স্মৃতিশক্তি থেকেও তেমনি। কালের আবর্তন ও বিবর্তন এবং উন্নতি ও অবনতি সব কিছু যে একমাত্র আল্লাহ্‌র মুঠোর মধ্যে নিবদ্ধ, একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো। দ্বীনের শত্রুরা কোন এক পর্যায়ে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত হলেও তা যে স্থায়ী নয়, এবং এরূপ অবস্থায় পড়েও যে সত্য আদর্শবাদীদের কোনরূপ নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হওয়ার একবিন্দু প্রয়োজন নেই, এ কাহিনী থেকে তা অকাট্যভাবে জানা গেল।

অতঃপর এ গুহাবাসীরা কতদিন বেঁচে ছিল, কুরআন সে বিষয়ে কোন আলোকপাত করছেনা, তা নিষ্প্রয়োজনও বটে। আল্লাহ যতদিন চেয়েছেন ততদিনই তারা বেঁচে ছিল। পরে তারা প্রাণত্যাগ করে। পরবর্তী সময়ে ভক্ত-প্রেমিক ও নিষ্ঠাবান লোকদের মধ্যে তাদের স্মৃতিচিহ্নটি কি রকমের হওয়া উচিত তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। অতঃপর কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

إِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوْا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ط رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ط قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا -

ঠিক এ সময়েই লোকেরা পরস্পর বিতর্ক করতে লাগল যে, এদের ব্যাপারে কি করা যায়? লোকেরা বলল ঃ এই গুহাটির ওপর একটি প্রাসাদ রচনা কর (তা স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে, এর বেশি কিছু করা ঠিক হবেনা)। ওদের ওপর দিয়ে কি অবস্থা বয়ে গেছে, তাদের রব্ব-ই তা ভালো জানেন। তখন এই লোকেরা যারা প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল বলল ঃ ঠিক আছে, আমরা ওদের সমাধির ওপর একটা উপাসনাগার নির্মাণ করব। *(সূরা কাহাফ ঃ ২১)*

ওদের প্রতি জনগণের এই উৎসাহ-উদ্দীপনা সেই সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি; একটি স্মৃতি চিহ্ন নির্মাণ করাতে তা সব নিঃশেষ হয়েও যায়নি। বিশ্ব-ইতিহাস এবং প্রতিটি ধর্ম কাহিনীতে তাদের উল্লেখ চিরন্তন ও শাশ্বত; চির ভাস্বর হয়ে থাকবে তাদের এই আদর্শবাদী অনমনীয়তা এবং ন্যায় ও সত্যের জন্যে আত্মদানের এই অমর কাহিনী। সেই সঙ্গে যুগে যুগে দেশে দেশে পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে ধর্ম-বিরোধী শক্তির দাপটে সাময়িকভাবে পরাজয় বরণকারী আদর্শবাদী বিপ্লবী যুবশক্তির এ চিরস্মরণীয় ঘটনার।

মানবেতিহাসের কোন একটা পৃষ্ঠাও কি এরূপ মর্মস্পর্শী কাহিনী থেকে রিক্ত?

○